গ্রন্থবীক্ষণ

উপনিষদের গল্প, গল্পে উপনিষদ

তুলসীপ্রসাদ বাগচী

Swami Tattwananda, *Upanishadic Stories and Their Significance*, (Advaita Ashrama : Kolkata, 2019, page : 136, Price: Rs. 60.00

আমেরিকা থেকে ফিরে এসেছেন স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৯৭)। 'তাঁহার জীবনে লভিয়া জীবন' সমস্ত দেশ জেগে উঠেছে, পরাধীনতার গ্লানি ভুলে অখণ্ড ভারতবর্ষ তাঁর সাফল্যে গর্ব অনুভব করছে। দেশব্যাপী অভূতপূর্ব স্বাগত অভিনন্দন, শ্রদ্ধাপূর্ণ সংবর্ধনা ইত্যাদি হয়ে গেছে। এইসব কলরব-কোলাহল কিছুটা স্তিমিত হওয়ার পর, ক্লান্ত শরীরকে কিছুদিন বিশ্রাম দিতে স্বামীজী এসেছেন কলকাতার অদূরে কাশীপুরে, গোপাললাল শীলের বাগানে। সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন তাঁর বাল্যবন্ধু প্রিয়নাথ সিংহ, স্বামীজীর আদরের 'প্রিয় সিঙ্গি'। স্বামীজীর শরীর ক্লান্ত, কিন্তু মস্তিষ্ক ক্লান্তিহীন, তাঁর দিবারাত্রের চিন্তা দেশের কীভাবে ভাল হবে। বন্ধুর সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপের মধ্যেও সেই অসাধারণ চিন্তারাজির কিয়দংশের প্রতিফলন ঘটছে অবধারিতভাবেই। আমাদের পরম ভাগ্য যে প্রিয়নাথবাবু সেই মহামূল্যবান কথোপকথনের সারাৎসার লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন—যা ভবিষ্যৎ ভারতের এবং মানবসমাজের প্রতি স্বামীজীর অমূল্য দিঙ্‌নির্দেশ।

তামাক খেতে খেতে কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী বন্ধুকে বললেন, ''দেশের মহা দুর্গতি হয়েছে, কিছু কর্‌রে। ছোট ছেলেদের পড়বার উপযুক্ত একখানাও কেতাব নেই।" তারপর আইডিয়া দিচ্ছেন : ''রামায়ণ, মহাভারত, উপনিষদ্ থেকে ছোট ছোট গল্প নিয়ে অতি সোজা ভাষায় কতকগুলো বাঙলাতে আর কতকগুলো ইংরেজীতে কেতাব করা চাই। সেইগুলি ছোট ছেলেদের পড়াতে হবে।"

স্বামীজীর সেই সুমহান ইচ্ছাকে সম্মান জানিয়েই যেন মহাপুরুষ মহারাজের শিষ্য স্বামী তত্ত্বানন্দজী মহারাজ প্রায় ছয় দশক পরে 'উপনিষদ থেকে ছোট ছোট গল্প নিয়ে অতি সোজা ভাষায়... ইংরাজিতে' এই 'কেতাব'টি লিখেছিলেন। এর প্রথম সংস্করণ কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৬ সালে (ভি. এ. ত্যাগরাজনের সম্পাদনায়)। বইটি তৎকালে জনাদৃত হয়েছিল, তাই কালক্রমে এর আরও দুটি সংস্করণ হয়েছিল (১৯৬৫ ও ১৯৭৩ সালে)। লেখকের মৃত্যুর (১৯৭৬) পঁচিশ বছর পর এটি পুনরায় প্রকাশিত হয়েছিল রামকৃষ্ণ অদ্বৈত

আশ্রম, কালাডি থেকে (২০০১)। এরপর এর বর্তমান সংস্করণ (পঞ্চম সংস্করণ) প্রকাশ করলেন কলকাতার অদ্বৈত আশ্রম (আগস্ট ২০১৯)। এটি অবশ্য কেবলমাত্র আগের সংস্করণের 'পুনর্মুদ্রণ' নয়, আদ্যোপান্ত সংশোধিত এবং সম্পাদিত নতুন সংস্করণ। বইটি পড়ে মনে হল, পূজনীয় তত্ত্বানন্দজী এক অসাধ্য সাধন করেছেন; মাত্র ১৩৬ পৃষ্ঠার মিতায়তন এই বইটি (১৪ সেমি ×২১.৫ সেমি) যেন প্রাথমিক স্তরের একটি ছোটখাট উপনিষদ-বিশ্বকোষ হয়ে দাঁড়িয়েছে!

আজকের পাঠকের হাতে এই অমূল্য বইটি তুলে দেওয়ার আগে এর সময়োপযোগী পরিমার্জনার প্রয়োজন অনুভব করেছেন দায়িত্বশীল প্রকাশক এবং সেই সুকঠিন কাজটি করবার গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল হায়দরাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজি বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক এম শিবরামকৃষ্ণ মহাশয়ের উপর। বিদ্বান ও ভক্ত অধ্যাপক মহাশয় এ-কাজটি করেছেন স্বভাবসিদ্ধ অনায়াস দক্ষতায়। উপরন্তু পাঠক হিসেবে আমাদের বাড়তি পাওনা হল তাঁর লেখা একটি ক্ষুদ্র (মাত্র দুই পৃষ্ঠার) কিন্তু তথ্যবহুল 'ভূমিকা'। সেখানে তিনি দেখিয়েছেন যে উপনিষদের ঋষিরা কীভাবে বিভিন্ন রকমের গল্প, উপাখ্যান, আলোচনা ও সংলাপের মাধ্যমে বিমূর্ত দার্শনিক চিন্তাকে সাধারণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। কারণ তাঁরাও তো সামাজিক মানুষই ছিলেন, তাঁদের পরিবার-পরিজন ছিল, আশ্রম ছিল, শিষ্যবর্গ ছিলেন, সংসার ছিল। সেইসঙ্গে কখনও কখনও তাঁদের দুর্জনের অত্যাচার বা উপদ্রবও সহ্য করতে হত। সেইসব অপকর্ম যখন সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যেত তখন সুরক্ষা বা প্রতিবিধানের জন্য তাঁদের যেতে হত স্থানীয় রাজা বা শাসকের কাছে। পক্ষান্তরে সেইসব রাজাও উপকৃত হতেন তাঁদের সমীপাগত ঋষিদের প্রজ্ঞার দ্বারা। এভাবে পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে দুই পক্ষেরই উপকার হত। রাজন্যবর্গ যেমন ঋষিদের প্রজ্ঞালোকে রাজধর্ম পালন করতে পারতেন, ঋষিরাও নিশ্চিন্তে তাঁদের সাধনা, জ্ঞানান্বেষণ, অধ্যাপনা চালিয়ে যেতে পারতেন।

এছাড়া আরও একটা উপকার হত। ঋষিরা ব্রহ্মচিন্তার পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সংস্পর্শে এসে তাদের বিচিত্র জীবনযাত্রা, দৈনন্দিন সমস্যা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও জীবন-জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হতেন। সেইসব বিষয় তাঁদের বিচলিত করত, ফলে তাঁরা আশ্রমে ফিরে করুণার্দ্র হৃদয়ে মানুষের জাগতিক সমস্যা ও প্রশ্নের উত্তর সন্ধানে ব্রতী হতেন। তাঁদের সেইসব অমূল্য জীবন-গবেষণার ফলাফলও লিপিবদ্ধ আছে উপনিষদের পাতায় পাতায়। এভাবেই 'বনের বেদান্ত' ছড়িয়ে পড়ত নাগরিক সমাজের বিভিন্ন স্তরে, তাত্ত্বিকতার গজদন্ত-মিনার থেকে বেদান্ত দর্শন হয়ে উঠত, স্বামীজীর ভাষায়, 'প্র্যাকটিকাল বেদান্ত'। এই কারণেই আজও আমরা উপনিষদকে জীবনের গ্রন্থ, জীবনমুখী গ্রন্থ বা জটিল জীবনের গ্রন্থিমোচনের গ্রন্থ হিসেবে সানন্দে গ্রহণ করতে পারি। একে সুপ্রাচীন এবং কেবলমাত্র সেই কারণেই, বহু-সম্মানিত দুর্বোধ্য ধর্মগ্রন্থ হিসেবে সভয়ে দূরে সরিয়ে রাখার দরকার নেই। একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে আজকের কর্মব্যস্ত ও কর্মক্লান্ত, বাইরে ধনী ও অন্তরে নিঃস্ব মানুষ কীভাবে উপনিষদের মধ্যে খুঁজে পাবেন পরম আশ্রয় তারই ইঙ্গিত রয়েছে এতে। এই প্রসঙ্গে শিবরামকৃষ্ণ মহাশয় বর্তমানের একজন সম্মানিত ইহুদি উপনিষদ-বিশেষজ্ঞের কথা তুলে ধরেছেন। তিনি ইজরায়েলের হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতবিদ্যার অধ্যাপক য়োহানান গ্রিন্‌শ্‌পন। তাঁর মতে উপনিষদ সমাজের সকল স্তরের মানুষের জন্য। যেমন একজন আত্মতৃপ্ত গৃহী মানুষ উপনিষদ পড়ে তাঁর নিজের সীমাবদ্ধতা বা ক্ষুদ্রতা সম্বন্ধে সহসা সচেতন হয়ে অন্তরের প্রসুপ্ত

ঋষিসত্তাকে জাগ্রত করতে উদ্বুদ্ধ হবেন; একজন সন্তানহারা শোকগ্রস্তা জননী উপনিষদ থেকে মৃত্যুর অতীত এক অনন্ত জীবনের সন্ধান পাবেন (কিসা গোতমীর মতো, যিনি ভগবান বুদ্ধদেবের কৃপালাভ করেছিলেন); চারপাশে নানারকম ভোগ্যবস্তুর ছড়াছড়ি দেখে যে-ছাত্রটি লোভে আকাঙ্ক্ষায় যন্ত্রণায় বিহ্বল হয়ে পড়েছে সে পাবে 'মণিরে মানো না মণি'-জাতীয় এক অপরূপ পরশমণির সন্ধান; যে-ছেলেটি তার পিতৃপরিচয় না জানার জন্য নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে সে পাবে আত্মবিশ্বাস (জাবাল সত্যকামের উপাখ্যান পড়ে); পিতার খামখেয়ালি বা অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনের জন্য যে-ছেলেটির জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে, সেও খুঁজে পাবে তার চিরকালীন স্নেহনীড়; যে-'বিদ্যেবোঝাই বাবুমশাই' সারাজীবন ধরে নানারকম তথ্যের বোঝা মাথায় বহন করে করে ক্লান্ত, দিশেহারা, তিনি পাবেন প্রকৃত জ্ঞানের অমৃত-প্রস্রবণের সন্ধান; জন্মাবধি নিজের চারপাশে মৃত্যুর করাল নৃত্য দেখতে দেখতে যে-বালকটি মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে, তার জন্যও রয়েছে উপনিষদের অমৃত-ওষধি, যার ফলে 'শঙ্কা হতে রক্ষা পাবে যারা মৃত্যুভীত'।

'উপনিষদ' [উপ+নি+সদ্+কৃপ্] শব্দটির একাধিক অর্থ হতে পারে। শব্দটির ব্যুৎপত্তির মধ্যে 'সদ্' ধাতুটি রয়েছে যার আবার একাধিক অর্থ হতে পারে, যেমন শিথিল করে দেওয়া, গতিশীল করা এবং বিলুপ্ত করা। সব জড়িয়ে তাই 'উপনিষদ' শব্দটির মানে হতে পারে এমন এক পরম জ্ঞান যা সংসারবন্ধন ক্রমেই শিথিল করে, জন্মমৃত্যুর আবর্ত থেকে মুক্ত করে, নিজের প্রকৃত স্বরূপ-সংক্রান্ত ভুল ধারণা দূর করে আমাদের ভগবানের (চরম সত্য, ব্রহ্মন্ বা পরমাত্মন্) দিকে নিয়ে যেতে পারে। যাইহোক, এইসব কঠিন কঠিন অর্থ যদি বুঝতে অসুবিধে হয়, তাহলে 'উপনিষদ' শব্দটির সবচেয়ে সহজ অর্থটাই নিতে পারেন—'কাছে গিয়ে বসা'। কে কার কাছে গিয়ে বসবেন? জিজ্ঞাসু ছাত্র উপযুক্ত শিক্ষকের কাছে গিয়ে বসবেন। ভক্ত গিয়ে বসবেন ভগবানের কাছে। শুধু তাই নয়, কর্মক্লান্ত দিশাহারা মানুষ কিছুক্ষণ একান্তে নিজের মুখোমুখি বসবেন। আজকের দিনে যখন বিশ্বমারির তাড়নায় আমাদের স্বেচ্ছায় গৃহবন্দি হয়ে থাকতে হচ্ছে, তখন নিজের সঙ্গে নিভৃতে 'মুখোমুখি বসিবার' প্রয়োজনীয়তাও বাড়ছে। সেটা কীভাবে করতে হয় তা আমরা জানি না, তাই এই অভূতপূর্ব পরিস্থিতিতে পড়বার ফলে বেড়ে চলেছে মানসিক ব্যাধি, উদ্বেগ, পারিবারিক হিংসা এবং একাকিত্ব। এক অন্ধকার বিবরের মধ্যে পড়ে গেছি আমরা। কিন্তু মাভৈঃ, কোনও ভয় নেই। সেই ঘোর অন্ধকারে আলোকবর্তিকা হাতে এসে দাঁড়িয়েছেন পরম সখা—উপনিষদ—আপনাকে বর্তমান অনিশ্চয়তার হাত থেকে মুক্ত করে, আপনার হাত ধরে নিয়ে যাবেন এক পরম শান্তির নিধানে।

বর্তমানে দুশো-র বেশি উপনিষদ মুদ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়। তার মধ্যে মাত্র দশটিকে বেছে নিয়ে তার ওপর বিস্তৃত ভাষ্য লিখেছিলেন ভগবান আদি শংকরাচার্য (৭৮৮-৮২০)। তাই এগুলিকে (ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য এবং বৃহদারণ্যক) প্রধান উপনিষদ বলে ধরা হয়। লেখক অবশ্য দশটি প্রধান উপনিষদের সবগুলিকে নিয়ে আলোচনা করেননি, তিনি বেছে নিয়েছেন ছয়টি (কেন, কঠ, প্রশ্ন, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক)। আলোচনাকে সংক্ষিপ্ত করতে গিয়ে হয়তো তিনি বাকি চারটি উপনিষদ নিয়ে আলোচনা করেননি—এজন্য পাঠক হিসেবে আমাদের একটু আক্ষেপ থেকে গেল।

আমরা বারবার 'আলোচনা' শব্দটি ব্যবহার করছি বলে ভাববেন না যেন যে এটি একটি জটিল দার্শনিক আলোচনার বই (এবং সেই কারণে সভয়ে

পরিত্যাজ্য)। না, লেখক কোনও জটিল আলোচনার মধ্যে ঢোকেননি, তার পরিবর্তে তিনি সাধারণ পাঠকের কথা মনে রেখে একটি সুন্দর ও মৌলিক পদ্ধতি নিয়েছেন; তিনি বেছে নিয়েছেন কিছু চিত্তাকর্ষক গল্প ও কথোপকথন (এজন্যই বইটির নাম 'উপনিষদের গল্প'—Upnishadic Stories)। কিন্তু শুধুমাত্র গল্প বা কথোপকথনই এর একমাত্র আকর্ষণ নয়, লেখক যেন পাঠকের সঙ্গে গল্প করতে করতে চলেছেন এবং মাঝেমাঝেই পাশ থেকে এইসব মহান শিক্ষার তাৎপর্যও পাঠককে ধরিয়ে দিচ্ছেন (এজন্যই বইটির উপনাম, 'এবং তাদের তাৎপর্য'—And Their Significance)। এইভাবেই তিনি সহজ সরল ভাষায় তুলে ধরেছেন উপনিষদের জীবনদায়ী শিক্ষার মূলসূত্রগুলি। যথার্থ শিক্ষকের মতো কাজ করেছেন লেখক এবং আমাদের তাতে খুব সুবিধে হয়েছে। যেমন—'ব্রহ্ম', 'আত্মন্' 'সর্বভূতের অন্তরাত্মা' এইসব কঠিন কঠিন শব্দ আমরা প্রায়ই শুনতে পাই ধর্মবেত্তাদের মুখে, জ্ঞানী দার্শনিকদের ক্লাসে। কিন্তু তাদের অর্থ ঠিকমতো বুঝতে পারি কি? বুঝতে না পারলেও চুপ করে থাকি, জিজ্ঞেস করতে সংকোচ হয়, ভয়ও পাই, পাছে দুর্বোধ্যতর শব্দের সুতীক্ষ্ণ শরাবলি ছুটে আসে আমাদের উদ্দেশে। ফলে আমাদের পরম্পরাগত পিতৃধন, পিতৃপ্রজ্ঞা থেকে যায় অনাবিষ্কৃত, রহস্যাবৃত, অবহেলিত। সাধারণ জিজ্ঞাসু অথচ কর্মব্যস্ত মানুষের এই বাস্তব সমস্যাটা অভিজ্ঞ লেখক ভালভাবেই জানতেন। তাই তিনি চেষ্টা করেছেন এইসব দুরূহ বিষয়কে যথাসম্ভব রহস্যমুক্ত করে পরিপূর্ণ জীবনবোধে সম্পৃক্ত, আনন্দময় এক জীবনদর্শন আমাদের সামনে তুলে ধরতে। আশ্বাসের কথা এই যে, এ-বইটি ভয়াবহ 'শুষ্কং কাষ্ঠং' ভাষায় লেখা কোনও অ্যাকাডেমিক দর্শনগ্রন্থ নয়। উপনিষদ থেকে লেখক বেছে নিয়েছেন এমন কতকগুলি অংশ যেখানে নাটকীয়তা আছে, আলোচনা আছে, প্রশ্নোত্তর আছে। আজকের দিনে উপনিষদ পড়তে গেলে আমাদের মনে যেসব প্রশ্ন বা সংশয় উঠতে পারে (যাকে আজকের ভাষায় Frequently Asked Questions বা FAQ বলতে পারি), তার অধিকাংশের উত্তর বা সমাধান আমরা পেয়ে যাচ্ছি এইসব আলোচনার মাধ্যমে। উপনিষদের মূল উদ্দেশ্য চরম সত্যের অন্বেষণ। আমাদের চারপাশে পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে যা দেখছি, শুনছি, শুঁকছি, আস্বাদ করছি, বা হাতে নিয়ে অনুভব করছি—তা তো সবই দেখছি পরিবর্তনশীল, ক্ষয়িষ্ণু, নশ্বর। তাহলে এমন কিছু আছে কি, যা অপরিবর্তনীয়, অক্ষয়, অবিনশ্বর? এমন কিছু সত্যিই আছে কি যাকে জানতে পারলে সব কিছুই জানা হয়ে যায়? এর উত্তরে উপনিষদের ঋষি সজোরে আমাদের আশ্বাস দিয়ে বলবেন—''হ্যাঁ, সত্যিই সেই পরম সত্তা বা চরম সত্য আছেন, আমি তাঁকে জেনেছি, তোমরাও চাইলে তাঁকে জানতে পারো।'' কীভাবে? তার জন্য অনেক উপায় আছে, তাদের মধ্যে প্রধান চারটি উপায় হচ্ছে জ্ঞানের পথ, ভক্তির পথ, নিষ্কাম কর্মের পথ এবং মনকে তীব্রভাবে একাগ্র করে মনের গভীরে অনুসন্ধান করার পথ।

এর মধ্যে জ্ঞানের পথের তিনটি মাত্র ধাপ আছে—শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন। প্রথমে এইসব মহান সত্যের কথা শুনতে হবে বা পড়তে হবে (শ্রবণ)। তারপরে সেটি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে (মনন)। এই দুটি কাজে প্রাথমিকভাবে আমাদের প্রচুর সাহায্য করতে পারে এই ছোট্ট বইটি। মন দিয়ে বইটি পড়তে অবশ্য বেশি সময় লাগবে না, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই পড়ে ফেলতে পারবেন, অর্থাৎ 'শ্রবণ'-এর কাজটা অনেকটাই হয়ে গেল। পড়বার পর আপনার ঔৎসুক্য বাড়বে, তখন আপনি বারবার বইটি পড়বেন, এইসব বিষয় নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে

চাইবেন, নিজের সাধ্যমতো বিচার-বিশ্লেষণ করবেন (মনে মনে এই কাজটা চলতেই থাকবে)। শুধু তাই নয়, আপনি তখন চাইবেন আপনার দৈনন্দিন জীবনের নানারকম ঘটনা বা ঘাতপ্রতিঘাতে এইসব শিক্ষার কার্যকারিতা পরীক্ষা করে দেখতে। এটাই 'মনন', আর এটা করতে করতে আপনি মজা পেয়ে যাবেন। তখন আপনি আরও এগিয়ে যাবেন, শ্রীরামকৃষ্ণ যে বলেছিলেন, ''এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও''—সেটাই আপনার জীবনে সত্য হয়ে দাঁড়াবে। আপনি আরও অনেক বইপত্র পড়বেন, উপনিষদের ক্লাস করবেন, ইউটিউব থেকে এই সংক্রান্ত ভিডিও ফাইল ডাউনলোড করে শুনবেন। সেইসব বিষয় নিয়ে মনে মনে তোলপাড় করবেন। এভাবে আপনি আপনার অজান্তেই শ্রবণ এবং মননের পথে অনেকটা এগিয়ে যাবেন।

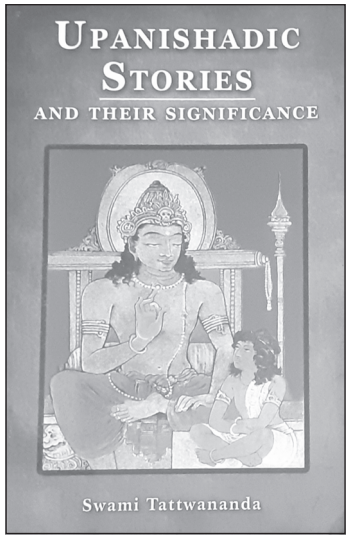

আবার, এতসব যখন জানছেন আর জানবেন, তখন আপনি স্বাভাবিকভাবেই সেগুলো আস্তে আস্তে আত্মীকরণ করে ফেলবেন এবং আপনার 'নিমেষে নিমেষে নয়নে বচনে, সকল কর্মে সকল মননে', এককথায় 'সকল হৃদয়তন্ত্রে' উপনিষদের মহান মঙ্গল-সংগীত ধ্বনিত হতে থাকবে। তারপরে আসবে আরও গভীরে যাওয়ার আকুতি আর সাধনা, যার পোশাকি নাম 'নিদিধ্যাসন' (ধ্যান করা)। সেটি অবশ্য এই বইয়ের বিষয়বস্তু নয়। তবে এই বৃহৎ এবং মহৎ অ্যাডভেঞ্চারের একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে (শ্রবণ এবং মনন) এই বইটি একাধারে আপনার বন্ধু এবং শিক্ষকের ভূমিকা পালন করতে পারে; সেখানেই বইটির সার্থকতা।

উপনিষদের অমৃতবার্তাবাহী এই বইটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে পারলে ভাল হত, কিন্তু তা তো সম্ভব নয়, তাই আপনাদের কৌতূহল আংশিকভাবে মেটাবার জন্য এর কয়েকটি অধ্যায়ের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে জানাচ্ছি। বাকিটা আপনারা নিজেরা পড়বেন, বুঝবেন, নিজেদের প্রাত্যহিক জীবনের নানারকম পরিস্থিতিতে সাফল্যের সঙ্গে সেইসব ঔপনিষদিক শিক্ষা কাজে লাগাবেন—এই আশা পোষণ করছি।

বইটিতে প্রথমেই রয়েছে একটি ছোট ভূমিকা এবং তার পরে রয়েছে আরও উনিশটি ছোট ছোট অধ্যায়। বইটির প্রথম অধ্যায়ে লেখক বেছে নিয়েছেন কেনোপনিষদের শিক্ষা। দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় কঠোপনিষদ। এটি স্বামীজীর মতে grand উপনিষদ, তিনি চাইতেন আমরা যেন এটি আদ্যন্ত মুখস্থ রাখি। মৃত্যুর রহস্য বোঝার জন্য এই উপনিষদটি আজকের দিনেও অপরিহার্য। মরণের পরে কি মানুষের বা অন্যান্য জীবের কোনও অস্তিত্ব থাকে? নাকি মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আমরা বলতে পারি, ''আজিকে হয়েছে শান্তি, জীবনের ভুলভ্রান্তি সব গেছে চুকে''? চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি যে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ হয়ে গেল, অথচ আমরা অন্তর থেকে কিছুতেই মেনে নিতে পারি না যে মৃত্যুর পরে আমরা আর থাকব না। মানতে পারি না বলেই তো মনে হয়, এই ধরাধামে ''আসব যাব চিরদিনের এই আমি''; শুধু তাই নয়—''সকল খেলায় করবে খেলা এই আমি।'' কিন্তু এ তো আমার কল্পনা মাত্র, সত্যটা তাহলে কী? কে আমাকে সেটা বলে দেবেন? একমাত্র স্বয়ং মৃত্যুরাজ (এবং ধর্মরাজ) যম

ছাড়া এর নিশ্চয়াত্মক মীমাংসা কে করতে পারেন? কিন্তু তাঁর কাছে মৃত্যুরহস্য জানতে গেলে তো আগে তাঁর কাছে যেতে হবে (জীবন্ত অবস্থায়!), গিয়ে তাঁকে সন্তুষ্ট করে তাঁর কাছ থেকে মৃত্যুরহস্য জেনে নিয়ে আবার এই মর্ত্যধামে ফিরে এসে সবাইকে সেটি জানাতে হবে। সেটা কীভাবে সম্ভব? সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করলেন আরুণি উদ্দালকের বালক পুত্র নচিকেতা। মৃত্যুভীত সমগ্র মানবজাতির হয়ে তিনি একলাই যমপুরীতে গিয়ে সোজাসুজি যমরাজার কাছে জানতে চাইলেন, ''মৃত্যুর পরে কি আমাদের কোনও অস্তিত্ব থাকে? কেউ বলেন 'থাকে', কেউ বলেন 'থাকে না', তাই আমি স্বয়ং আপনার কাছ থেকেই এর মীমাংসা শুনতে চাই।'' এই চিরন্তন প্রশ্ন আজকের বিশ্বমারিত্রস্ত মানুষের কাছে যেন আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে—পথের শেষ কোথায়, কী আছে শেষে? মৃত্যুরাজ এবং বালক নচিকেতার আত্মতত্ত্ব বিষয়ক কথোপকথন সুললিত ভাষায় বর্ণনা করেছেন লেখক।

স্বয়ং যমরাজের মুখে মৃত্যুতত্ত্ব শুনছেন জিজ্ঞাসু বালক নচিকেতা—''আশ্চর্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা''-র এই চিরন্তন বিষয়টি ধরা পড়েছিল শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর ধ্যানদৃষ্টিতে, সেটি তিনি ধরে রেখেছিলেন চিত্রপটে। রক্তাম্বরধারী ধর্মরাজের আনন বালক শ্রোতার প্রতি স্নেহার্দ্র, নেত্রদ্বয় অর্ধনিমীলিত, আত্মমগ্ন, দক্ষিণ হস্তে বরাভয় মুদ্রা। পদতলে বামপার্শ্বে উপবিষ্ট শ্রদ্ধাবিষ্ট শ্রোতা নচিকেতা তদ্‌গতচিত্তে কৃতান্তরাজের মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন, শুনছেন দুরূহ দুর্জ্ঞেয় বিষয়, মৃত্যুর পরে কী হয়, তখন আমাদের অস্তিত্ব থাকে কি না। পেছনে বামদিকে দীপাধারে একটি মৃদুজ্যোতি প্রদীপ জ্বলছে আত্মজ্ঞানের প্রতীকরূপে। সেই অসাধারণ চিত্রটি এই বইয়ের প্রচ্ছদপটে মুদ্রিত হয়েছে, বইটিকে দিয়েছে এক ধ্রুপদী ব্যঞ্জনা।

তৃতীয় অধ্যায়ে রয়েছে অথর্ব বেদের অন্তর্গত প্রশ্নোপনিষদের কিছুটা অংশ—'অনুসন্ধান'। শ্রদ্ধেয় লেখক ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে উপনিষদের ঋষিদের বক্তব্যের কথা লিখেছেন। ধ্যানে যেসব সত্য তাঁদের সামনে উদ্‌ঘাটিত হত সেইসব ধ্যানলব্ধ সত্য তাঁরা শিষ্যদের শেখাতেন। সেইসব শিক্ষার কিয়দংশ সংকলিত হয়েছে এই উপনিষদে। তার সঙ্গে আজকের দিনের বিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত সত্যের তুলনা করে তিনি লিখেছেন :

''...These are not mere words but revelations of the truths of creation which today's scientists are exploring in their own ways. But there is a difference. For the sage, everything in Nature is enveloped by the presence of God. For the scientist, every aspect of Nature is, by and large, a physical-mental interaction, and this can be understood in terms of reason, in clearly formulated terms after experimentation forming physical laws. (p. 40)''

আগেই বলেছি, এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৬ সালে। সেইসময়ের প্রেক্ষিতে লেখক যা লিখেছেন তা ঠিক। কিন্তু আজকের দিনে বিজ্ঞান অনেক এগিয়ে গেছে। আধুনিক বিজ্ঞানীরা প্রকৃতির রহস্য বোঝবার সময়ে মূলত ('by and large') জড়বস্তু আর মানুষের মনের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যেই আবদ্ধ থাকেন না। যেখানে উপনিষদের ঋষি বলবেন জগতের সবকিছু 'enveloped by the presence of God' সেখানে আধুনিক কোয়ান্টাম বিজ্ঞানীরা ওই কথাটাই একটু অন্যভাবে বলবেন, সেখানে God-এর বদলে তাঁরা Quantum Field বা Divine Matrix-এর কথা বলবেন (যা মূলত চৈতন্য ছাড়া

আর কিছুই নয়)। ভাষার পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু ভাবের পার্থক্য নেই—সেখানে 'সব শেয়ালের এক রা'।

এই অধ্যায়েই দেখছি, ঋষি পিপ্পলাদকে তাঁর একজন জিজ্ঞাসু ছাত্র জিজ্ঞেস করছেন, আমরা আমাদের চেতনাকে বিভিন্ন স্তরে বিভিন্নভাবে অনুভব করি, যেমন—যখন জেগে আছি তখন একরকম, যখন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছি তখন আর-এক রকম, আবার যখন গভীর ঘুমে (সুষুপ্তি) আচ্ছন্ন হয়ে আছি তখনকার অবস্থায় আমার তো কোনও অনুভবই থাকে না। তাহলে এই তিনটি অবস্থার প্রকৃত অনুভবকারী কে? এই দুরূহ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে গুরু দেখলেন যে এটি তাঁর জিজ্ঞাসু ছাত্রদের বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে। তাই তিনি এই তত্ত্বটি বোঝাবার জন্য একটা দৈনন্দিন ও স্বাভাবিক ঘটনার উদাহরণ দিলেন :

"The waking state is like Sun whose light reveals objects. Suppose there are no objects for the Sun to shine upon. Even then the Sun continues to shine. The same is true of the Self also." (p. 46)

এখানে 'কথামৃতে'র মনোযোগী পাঠকের মনে পড়ে যাবে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা। এই জটিল তত্ত্বটি ঠাকুর একজন 'ভক্ত' (তিনি সম্ভবত কথামৃতকার স্বয়ং) এবং 'ভক্ত ভৈরব' গিরিশচন্দ্রকে কত সহজ একটি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন :

"শ্রীরামকৃষ্ণ—মনে কর দশটা জলপূর্ণ ঘট আছে, তার মধ্যে সূর্যের প্রতিবিম্ব হয়েছে। কটা সূর্য দেখা যাচ্ছে?

ভক্ত—দশটা প্রতিবিম্ব। আর একটা সত্য সূর্য তো আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—মনে কর, একটা ঘট ভেঙে দিলে, এখন কটা সূর্য দেখা যায়?

ভক্ত—নয়টা [প্রতিবিম্ব]; একটা সত্য সূর্য তো আছেই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, নয়টা ঘট ভেঙে দেওয়া গেল, কটা সূর্য দেখা যাবে?

ভক্ত—একটা প্রতিবিম্ব সূর্য। একটা সত্য সূর্য তো আছেই।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশের প্রতি)—শেষ ঘট ভাঙলে কি থাকে?

গিরিশ—আজ্ঞা, ওই সত্য সূর্য।"

এই পর্যন্ত ঠাকুরের প্রশ্নের উত্তরে ওই ভক্ত এবং গিরিশচন্দ্র যা বললেন তার সঙ্গে উপনিষদে আলোচ্য প্রসঙ্গের কোনও বিরোধ নেই, আর তা যুক্তিসংগতও বটে। দশটা জলপূর্ণ ঘট ভেঙে গেলেও আকাশের সূর্য বা সত্য সূর্য তো থাকবেই। কিন্তু, এই প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুর যা বললেন, তা সম্পূর্ণ অকল্পনীয়।

"শ্রীরামকৃষ্ণ—না। কি থাকে তা মুখে বলা যায় না। যা আছে তাই আছে। প্রতিবিম্ব সূর্য না থাকলে সত্য সূর্য আছে কি করে জানবে! সমাধিস্থ হলে অহং তত্ত্ব নাশ হয়। [তাই] সমাধিস্থ ব্যক্তি [সমাধি থেকে] নেমে এলে কি দেখেছে মুখে বলতে পারে না!"

এখানে ঠাকুর একেবারে আধুনিক বিজ্ঞানের, বিশেষত কোয়ান্টাম তত্ত্বের মূল কথাটাই বলে দিলেন। দ্রষ্টা যদি না থাকে, তাহলে দৃষ্ট বস্তুও থাকে না (অন্তত আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপে তো থাকেই না)। তাহলে তখন কী থাকে? কিছু তো একটা থাকেই, তাই না? এই প্রশ্নের উত্তরে আজকের বিজ্ঞানীরা বলবেন, বস্তুটির কোনও দ্রষ্টা না থাকলে তার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অস্তিত্বও থাকে না, সেটি তখন কোয়ান্টাম ক্ষেত্রে 'সম্ভাবনার তরঙ্গ'-রূপে থাকে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, তখন 'যা আছে তা আছে' (একে আমরা বেদান্তের পরিভাষায় 'সৎ' বা পরম অস্তিত্ব বলতে পারি)। আর তাঁর এই কথাটিও আজকের দিনের বিজ্ঞানের

সিদ্ধান্ত—প্রতিবিম্ব সূর্য না থাকলে সত্য সূর্য আছে কী করে জানবে! তখন তো দ্রষ্টাই নেই (দশম ঘটটাও ভেঙে গেছে), তখন 'Even then the Sun continues to shine'—এই কথাটিও বলা যায় না।

চতুর্থ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় পঞ্চকোশ, এটি নেওয়া হয়েছে তৈত্তিরীয়োপনিষদ থেকে। এখানে লেখক ঋষিকে অনুসরণ করে বলেছেন, সাধক বিজ্ঞানময় কোশে (চতুর্থ কোশ) উত্থিত হলে এবং সেখানে অবস্থান করলে ব্রহ্মন্-কে 'বিজ্ঞান'রূপে অনুভব করতে পারেন। এটাই চরম লক্ষ্যের (পঞ্চম কোশ) ঠিক আগের ধাপ। এরপরের ধাপে (আনন্দময় কোশ) সাধক যখন উন্নীত হবেন, তখন তিনি ব্রহ্মন্-কে 'আনন্দ'রূপে অনুভব করবেন ('Brahman, in short, is bliss itself')—''আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ'' (তৈত্তিরীয়োপনিষদ, ৩/৬), এবং ''all beings have their origin in Bliss, sustained by Bliss, and are withdrawn into Bliss''—''আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি।'' এখানেই বারুণী ভৃগুর সাধনার সমাপ্তি—''সৈষা ভার্গবী বারুণী বিদ্যা।'' এবারে তাঁর ব্যুত্থানের পালা, এবারে তিনি নিচের স্তরে নামতে নামতে দেখবেন, ব্রহ্মন্ কেবলমাত্র আনন্দময় কোশেই সীমাবদ্ধ নন, তিনি বিজ্ঞানময়, মনোময়, প্রাণময় এবং অন্নময় কোশেও সমানভাবে রয়েছেন—''...there is nothing that is outside or that is not Brahman. Therefore, food, vital breath, mind [and knowledge]–are all Brahman. Anna, food, is as fully Brahman as Ananda, bliss is. ...Everything is that Supreme Reality. Nothing else exists."

এখানে বেদান্তের একেবারে প্রারম্ভিক স্তরের ছাত্র হিসেবে আমার একটি সংশয় আছে। ঋষির মতে আনন্দময় কোশের ওপরে আর কোনও স্তর নেই। অন্নময় কোশ থেকে ধাপে ধাপে প্রাণময়, মনোময় এবং বিজ্ঞানময় কোশ অতিক্রম করে আনন্দময় কোশে উঠে যাওয়া এবং সেখান থেকে আবার ধাপে ধাপে নিচে নেমে আসা—এই হচ্ছে বেদান্তসাধনার মূলকথা। কিন্তু সত্যিই কি তাই? আনন্দময় কোশে উঠতে পারলেই কি সাধক নামরূপের রাজত্বের ঊর্ধ্বে উঠে পরম আকাঙ্ক্ষিত নির্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন হতে পারেন? ওই আনন্দময় কোশে গিয়ে আনন্দ অনুভব করছেন কে? সাধক নিজেই তো সেটি অনুভব করছেন (সবিকল্প সমাধি)। তাই শেষ বিচারে, আনন্দময় কোশও তো একটা কোশ মাত্র (সর্বোচ্চ কোশ হলেও)। সেই সর্বোচ্চ কোশেও যদি সাধক আটকে থাকেন, তাহলে তিনি নামরূপের রাজত্বের ঊর্ধ্বে উঠবেন কীভাবে? সাধককে তাই আনন্দময় কোশেরও ঊর্ধ্বে উঠতে হবে, তবেই তিনি নামরূপের রাজত্বের বাইরে গিয়ে নির্বিকল্প সমাধিলাভ করতে পারবেন।

এই প্রসঙ্গে আমরা 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থের 'ঠাকুরের বেদান্তসাধন' নামক অধ্যায়টির কথা স্মরণ করতে পারি। শ্রীমৎ তোতাপুরীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তরুণ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তসাধনা করছেন। গুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে তিনি চেষ্টা করছেন 'মনকে সর্বতোভাবে নির্বিকল্প করিয়া আত্মধ্যানে নিমগ্ন' হয়ে যেতে। কিন্তু কিছুতেই সেটি পারছেন না। ঠাকুরের নিজের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন লীলাপ্রসঙ্গকার : ''ধ্যান করিতে বসিয়া চেষ্টা করিয়াও মনকে নির্বিকল্প করিতে বা নামরূপের গণ্ডি ছাড়াইতে পারিলাম না। অন্য সকল বিষয় হইতে মন সহজেই গুটাইয়া আসিতে লাগিল, কিন্তু ঐরূপে গুটাইবামাত্র তাহাতে শ্রীশ্রীজগদম্বার চিরপরিচিত চিদ্‌ঘনোজ্জ্বল মূর্তি

জ্বলন্ত জীবন্তভাবে সমুদিত হইয়া সর্বপ্রকার নামরূপ ত্যাগের কথা এককালে ভুলাইয়া দিতে লাগিল।”

এই অংশটি যদি আমরা তৈত্তিরীয়োপনিষদ-কথিত পঞ্চকোশের (অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময়) আলোকে বুঝতে চাই, তাহলে বলতে পারি যে প্রথম চারটি কোশ থেকে ঠাকুরের ‘মন সহজেই গুটাইয়া আসিতে লাগিল’। কিন্তু সেই অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে গেল পঞ্চম কোশে (আনন্দময় কোশ) উঠে। অনুমান করতে পারি, আনন্দময় কোশে গিয়ে আনন্দময়ী ‘শ্রীশ্রীজগদম্বার চিরপরিচিত চিদ্‌ঘনোজ্জ্বল মূর্তি জ্বলন্ত জীবন্তভাবে’ যখন ঠাকুরের মনে ‘সমুদিত’ হল, তখন ঠাকুর পরম দিব্যানন্দে ভরপুর হয়ে গেলেন এবং ‘সর্বপ্রকার নামরূপ ত্যাগের কথা এককালে’ ভুলে গেলেন। এ তো খুবই স্বাভাবিক। মাতৃসান্নিধ্যের ওই রকম অপার্থিব আনন্দ পেলে কে আর সেটা ছেড়ে যেতে চাইবেন? ঠাকুরও তা চাইলেন না, ফলে যা হওয়ার তাই হল—গুরুমুখে ‘‘[বেদান্তের] সিদ্ধান্তবাক্যসকল শ্রবণপূর্বক ধ্যানে বসিয়া যখন উপর্যুপরি তিন দিন ঐরূপ হইতে লাগিল, তখন নির্বিকল্পসমাধিসম্বন্ধে একপ্রকার নিরাশ হইলাম।” ব্যর্থ ছাত্র তখন হতাশ হয়ে ‘চক্ষুরুন্মীলন করিয়া’ গুরুদেবকে রিপোর্ট দিলেন, ‘‘হইল না, মনকে সম্পূর্ণ নির্বিকল্প করিয়া আত্মধ্যানে মগ্ন হইতে পারিলাম না।” অথচ তাঁর নিরাকারবাদী বেদান্তী গুরুদেব হার্ড টাস্ক মাস্টার, তিনি কিছুতেই ছাড়বার পাত্র নন। অপারগ শিষ্যকে ‘তীব্র তিরস্কার করিয়া’ একটি ‘ভগ্ন কাচখণ্ড’ নিয়ে ‘সূচের ন্যায় উহার তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ [ঠাকুরের] ভ্রূমধ্যে সজোরে বিদ্ধ করিয়া’ আদেশ করলেন, ‘এই বিন্দুতে মনকে গুটাইয়া আন।’ নিরুপায় শিষ্য ‘তখন পুনরায় দৃঢ়সংকল্প করিয়া ধ্যানে’ বসলেন এবং তখনও সেই একই ঘটনা ঘটল, অর্থাৎ ‘...জগদম্বার শ্রীমূর্তি পূর্বের ন্যায়’ [তাঁর] মনে উদিত হল। এবারে কিন্তু শিষ্য মনে মনে প্রস্তুত হয়েই ছিলেন, তিনি আর আনন্দময় কোশে অবস্থান করতে রাজি নন; এবারে তিনি যে-ভয়ংকর কাজটি করলেন তা যেকোনও মাতৃভক্ত সাধকের কাছে চরম ব্ল্যাসফেমি বলে মনে হতে পারে, কিন্তু এছাড়া তো কোনও উপায়ও নেই, মা জগদম্বার আদেশেই তো তিনি বেদান্তসাধনায় ব্রতী হয়েছেন। তাই, ‘...জগদম্বার শ্রীমূর্তি পূর্বের ন্যায় [তাঁর] মনে উদিত হইবামাত্র [তিনি] জ্ঞানকে অসি কল্পনা করিয়া’ ওই পরমপ্রিয়, পরমারাধ্যা মাতৃমূর্তিকে ‘মনে মনে দ্বিখণ্ড’ করে ফেললেন! ব্যাস, তখন আর তাঁর মনে কোনও বিকল্প [জগদম্বা এবং সাধক এই ভেদজ্ঞান] রইল না; ‘একেবারে হু হু করিয়া উহা’ [‘উহা’ মানে কে? মন? কিন্তু, তখন তো সাধকের মন বলে আর কিছুই নেই, মনোময় কোশের রাজত্ব তো তিনি অনেক আগেই ছাড়িয়ে এসেছেন] ‘সমগ্র নামরূপ রাজ্যের উপরে উঠিয়া গেল’ এবং তিনি নির্বিকল্প সমাধিমগ্ন হলেন (মাত্র তিনদিনেই!)। সেই অবস্থাতেই ‘দিনের পর দিন আসিয়া দিবসত্রয় অতিবাহিত হইল।’ তাহলে ঠাকুর শেষ পর্যন্ত জোর করে আনন্দময় কোশের ঊর্ধ্বে উঠে, পরিচিত নামরূপের সীমানা পার হয়ে, বিশুদ্ধচৈতন্যরূপিণী জগন্মাতার নির্গুণ, নিরাকার এবং নির্বিকল্প রূপটিও অনুভব করলেন।

এরপর পঞ্চম থেকে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে লেখক ছান্দোগ্য উপনিষদ থেকে নয়টি বিষয় বেছে নিয়েছেন আলোচনার জন্য। সবশেষে ছয়টি অধ্যায়ে (চতুর্দশ থেকে ঊনবিংশ) রয়েছে বৃহদারণ্যক উপনিষদ থেকে বেছে নেওয়া ছয়টি বিষয়। অপূর্ব সব বিষয় নিয়ে সহজভাবে আলোচনা করেছেন লেখক।

এবারে পাঠক হিসেবে (সমালোচক হিসেবে নয়) কয়েকটি বিষয়ে প্রকাশকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

১। বইয়ের শেষে কোনও নির্দেশিকা নেই।

থাকলে পাঠক প্রয়োজনমতো বিষয়টি অনায়াসে খুঁজে নিতে পারতেন।

২। এই বইটি পড়বার পরে আগ্রহী পাঠক উপনিষদ সম্বন্ধে আরও কিছু জানতে চাইবেন। তাঁদের সাহায্যার্থে উপনিষদ-সংক্রান্ত কিছু বইয়ের তালিকা দিতে অনুরোধ করছি।

৩। বইটিতে অনেক সংস্কৃত শব্দ রয়েছে, তাদের সঠিক উচ্চারণ কেমন হবে সেই বিষয়ে পাঠকের মনে সন্দেহ থাকতে পারে। সাধারণত এই ক্ষেত্রে একটা আন্তর্জাতিক নিয়ম মেনে চলার রীতি আছে (International Congress of Orientalists, Athens, 1912)। সেই রীতি অনুসারে প্রতিটি সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে প্রয়োজনীয় সংকেতচিহ্ন থাকা একান্ত প্রয়োজন।

৪। আলোচনার সঙ্গে কিছু ছবি বা রেখাচিত্র থাকলে বইটি আর একটু দৃষ্টিনন্দন ও সহজবোধ্য হত।

৫। এইসব নরমপৃষ্ঠ বই তো পাঠকদের হাতে হাতে ঘুরবে, তাঁরা মার্জিনে মন্তব্য লিখবেন, কোনও কোনও পঙ্‌ক্তির নিচে দাগ দেবেন। সেকথা মনে রেখে বইটিকে আর একটু শক্ত কাগজে ছাপতে অনুরোধ করছি।

৬। সম্ভব হলে এর একটি বঙ্গানুবাদও প্রকাশিত হওয়া দরকার।

শুরুতেই বলেছি, 'উপনিষদ' শব্দটির একাধিক অর্থ আছে। তার একটি অর্থ যদি হয় 'কাছে গিয়ে বসা', তাহলে ভুলবেন না যে এর আর একটি অর্থ ঠিক এর বিপরীত—'গতিশীল' হওয়া। উপনিষদও কেবলমাত্র ভারতবর্ষে বসে না থেকে 'গতিশীল' হয়ে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। পাশ্চাত্যের মননশীল মানুষরা একে পরম সমাদরে বুকে তুলে নিয়েছেন। তার পুণ্য ইতিহাস নিষ্ঠার সঙ্গে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন স্বামী তথাগতানন্দজী মহারাজ—'Journey of the Upanishads to the West'। এই অবশ্যপাঠ্য বইটির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে বিশ্ববিশ্রুত বৈদান্তিক সন্ন্যাসী পরমপূজ্যপাদ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের একটি মহামূল্য আশীর্বচন। তার থেকে কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করে এই আলোচনা শেষ করছি :

''The mental climate of the Upanishads is saturated with the passion for Truth and similar passion for human happiness and welfare.

''The wheel of modern progress revolves faster decade after decade, and man everywhere is feeling dazed, unable to find his bearings. The modern crisis is thus a spiritual crisis, and modern man is seeking light to lead him out of the encircling gloom. His heart today is crying for Truth, for light and for life. To convert this twilight into the dawn of a brighter day is a challenge facing human knowledge and wisdom today."

সবশেষে বক্তব্য, উপনিষদ যদি ভারতবর্ষ থেকে যাত্রা শুরু করে পাশ্চাত্যদেশ হয়ে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে পারে, তাহলে চলুন, আমরাও স্বামী তত্ত্বানন্দজীর নেতৃত্বে আমাদের 'উপনিষদ' যাত্রা শুরু করি, এখনই। ৬ থেকে ৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দের চিনা দার্শনিক লাও-ৎসু (তাও-দর্শনের প্রবক্তা) বলেছিলেন, ''এক হাজার মাইলের সুদীর্ঘ যাত্রা শুরু হয় একটি ছোট পদক্ষেপ দিয়ে।" নিজেকে জানবার জন্য, নিজের প্রকৃত স্বরূপকে উপলব্ধি করবার উদ্দেশ্যে আমাদের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় এবং আনন্দদায়ক অভিযান শুরু হোক এই ছোট গাইড বইটি হাতে নিয়ে।